বদরের বীর

সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

AHSAN PUBLICATION

নবপ্রকাশ
শুধু বই নয়...
ইসলামী টাওয়ার, দোকান : ২০
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭৪ ৮৮৮ ৪৪১

সর্বোপরি *নবপ্রকাশ* নিয়ে বলতেই হয়। *নবপ্রকাশ* ইতিহাস, গল্প, উপন্যাস– এ তিন কিসিমের বই প্রকাশ করার মহান ব্রত নিয়ে প্রকাশনাশিল্পে নিজেদের কদম রেখেছে। আমি বরাবরই *নবপ্রকাশ*-এর এ প্রয়াসকে সাধুবাদ জানাই। আমাদের পাঠকমহল যখন দেশি আর ভিনদেশি বিভিন্ন বিধর্মী ও নাস্তিক লেখকের চরিত্রবিধ্বংসী বই পড়ে অধঃপতনের দিকে পা বাড়াচ্ছে, তখন *নবপ্রকাশ*-এর এমন উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে বৈকি। কেননা জ্ঞানের বিপ্লব জ্ঞান দিয়েই রুখতে হয়। কলমের বিরুদ্ধে কলম নিয়েই যুদ্ধে নামতে হয়। বইয়ের বিরুদ্ধে রাইফেল নিয়ে লড়াইয়ে নামলে পরাজয় অনিবার্য। ময়দানে দ্বন্দ্বযুদ্ধ লড়তে হলে সমমানের বই-অস্ত্র নিয়েই নামতে হবে। এ হিসেবে– *নবপ্রকাশ*-এর উদ্যোগ ধন্যবাদ পাওয়ার দাবিদার।

তাদের ভবিষ্যতের প্রতিটি কাজ আল্লাহর দরবারে কবুল হোক!

সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর
ধামরাই, ঢাকা

AHSAN PUBLICATION

সূচিপত্র

বদরের বীর	১১
ইস্পাহানের সাহাবা	১৭
ক্রীতদাস-পুত্র	৪৮
শেষ সম্রাট	৫৬
ভিনদেশি সওদাগর	৬২
অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা	৭৭
অলৌকিক	৮৫
ইয়ামামার বাজপাখি	৮৯
বেহেশতি হালুয়া	৯৭
প্রিয় ক্রীতদাসী	১০৭
ঈদের আনন্দ	১১১
নতুন সম্রাট	১১৫
মঙ্গোল-কাহিনি	১২১
তওবার রহমতে স্নাত	১২৯
যেমন কুকুর তেমন মুগুর	১৩৩
শিয়ারা জুতাচোর	১৩৬
প্রশ্ন চতুষ্টয়	১৪০

AHSAN PUBLICATION

ইস্পাহানের সাহাবা

আমি

আমি পারস্যের মাহবা ইবনে বুজখশান।

জন্মেছিলাম ইস্পাহানের শহরতলি জাই গ্রামে।

বাবা ছিলেন গ্রামের সরদার। প্রভাবশালী ব্যক্তি। ধর্মের পুরোহিত।

আগুনের উপাসক ছিলেন তিনি। পারস্যের আর সবাই যেমন ছিলো।

আমাকে ভালোবাসতেন খুব।

অন্তরের বাসনা ছিলো– আমাকে বানাবেন ধর্মের পুরোহিত।

আমরা ছিলাম অগ্নিপূজক। আগুনের পূজা করতাম। অগ্নিশ্বর।

আমাদের বাড়িটি ছিলো বিশাল। পিতার বিত্ত-বৈভবের কমতি ছিলো না মোটেও। পিতা আমার জন্য আমাদের বাড়িতেই একটি মন্দির গড়ে দিলেন। অগ্নিশ্বরের মন্দির। সারাক্ষণ মন্দিরের বেদিতে প্রজ্বলিত রাখতে হতো আগুন। আগুনের উপাসনায় নিমগ্ন থাকতাম দিন-রাত। আগুন আমার উপাস্য। আগুন আমার পূজ্য। আগুন আমার ঈশ্বর।

ছোটবেলা থেকেই আগুনের পূজায় কেটেছে আমার অহর্নিশ। আগুনের সঙ্গে আমার সখ্য বেশ গাঢ়। দীর্ঘদিনের সাধনায় আমি দেখেছি আগুনের নানা রূপ। আগুনের নানা রঙের সঙ্গে হয়েছে আমার পরিচয়।

আমার বাবা আমাকে বাড়ির বাইরে খুব একটা যেতে দিতেন না। যদিও বাড়ির বাইরে যেতাম দু-একদিন, আমাদের গ্রামটির বাইরে কখনো পা রাখার সৌভাগ্য হয়নি আমার। আমার কাছে আমাদের 'জাই' গ্রামটিই ছিলো আমার পৃথিবী। আমার আহ্নিক ও বার্ষিক গতির একমাত্র কক্ষপথ ছিলো কেবল আমাদের মন্দিরটি। আমাদের মন্দিরে প্রজ্বলিত অগ্নিশ্বরই ছিলো আমার সে পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু।

এক নতুন পৃথিবী

আমার বাবা।
সম্মানিত। বিত্তবান। ধর্মীয় পুরোহিত।
তিনি এ অঞ্চলের প্রভাবশালী ধনী ব্যক্তি।
সম্পদ এবং ধর্ম– দু' বিষয়েই তিনি ছিলেন ব্যক্তিত্ববান।
এলাকার লোকজন সম্মান করতেন তাকে।

আমাদের গ্রাম ছাড়াও আশপাশের আরো কয়েকটি এলাকায় আমার বাবার ভূ-সম্পত্তি ছিলো। কোথাও ফসলের চাষ হতো, কোথাও ছিলো ভেড়ার খামার, কোথাও-বা নাশপাতি বাগান।

আমি তখন কেবল কৈশোর পেরোনো সদ্যতরুণ। আমি বড় হয়েছি– এটা বোঝানোর জন্য একদিন বাবা আমাকে দু-তিন গ্রাম দূরের এক খামারে পাঠালেন। সেখানে নতুন কিছু ঘর তৈরি হচ্ছিলো, নতুন একটা বাড়ি করার চিন্তাও ছিলো তার মনে। তাই আমাকে দেখতে পাঠালেন পুরো বিষয়টি।

ভেতরে ভেতরে আমি দারুণ উত্তেজিত। এই প্রথম বাবা কোনো বড় কাজ দিয়ে আমাকে গ্রামের বাইরে পাঠাচ্ছেন। ছোট এ জীবনের এতোটা বছর আমি একপ্রকার বন্দী হয়েই কাটিয়েছি। বাবা অনেক ভয় পেতেন আমাকে নিয়ে, অন্য কোনো ধর্মের আঁচ যদি লেগে যায় আমার মনে, এ কারণে। কিন্তু আমিও মানুষ, আমারও পৃথিবীটা দেখার সাধ আছে, মানুষের সঙ্গে মেশার বাসনা আছে! তাই আজ যখন সুযোগ পেয়েছি, মন ভেতরে ভেতরে গুনগুন করে আনন্দের গান গেয়ে চলেছে। সকাল সকাল তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। ঘোড়া চলছিলো দুলকি চালে। আমি চারদিকের পৃথিবী দেখতে দেখতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কী রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিন! চারদিকে সবুজ গাছপালা, পাতার ফাঁকে ফাঁকে ডাকছে পাখি। আমি দু' নয়নভরে প্রকৃতির স্বয়ম্ভর রূপবিভা দেখে দেখে চলছি।

রাস্তার পাশে কিছু লোক দেখলাম।
অন্য রকম।
তাদের বেশভূষা আলাদা। তাদের চালচলন আলাদা।
রাস্তার পাশে তাদের একটা উপাসনালয় দেখলাম।
সেখানে বেশ কিছু লোক জড়ো হয়েছে।
তাদের দেখে আমার কৌতূহল হলো। আমি এগিয়ে গেলাম।

প্রবেশ করলাম তাদের উপাসনালয়ে।

উপাসনালয়ের ভেতরে তারা উপাসনা করছে। তাদের উপাসনা অন্য রকম। আমাদের মতো নয়। আমাদের মতো তারা আগুনের উপাসনা করছে না। তারা অদৃশ্য কিছুর দিকে তাদের মাথা নত করছে। তাঁর সমীপে প্রার্থনা করছে। তাদের সামনে আমি কোনো দৃশ্যমান উপাস্য দেখলাম না। আমার কৌতূহল আরো বেড়ে গেলো। তাদের উপাসনা আমাকে সম্মোহিত করলো। অভিভূত হলাম।

আমি এগিয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম– 'এখানে কী হচ্ছে?'

'প্রার্থনা।' জবাব দিলো সে।

'কিসের প্রার্থনা?'

'ঈশ্বরের প্রার্থনা, আবার কার!'

'কিন্তু এখানে তো কোনো মূর্তি বা উপাস্য দেখছি না। তোমাদের ঈশ্বর কে? কার উপাসনা করো তোমরা? তোমাদের ধর্মের নামই বা কী?'

'আমরা খৃস্টান। আমরা একেশ্বরের উপাসনা করি। তাঁর কোনো মূর্তি নেই। তিনি নিরাকার। তিনি অধিষ্ঠিত আছেন সপ্তাকাশের উপরে। কেউ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না, তিনি সবাইকে অদৃশ্যভাবে পরিবেষ্টন করে আছেন। তিনি সকল ক্ষমতার উৎস। এ বিশ্ব-সৃষ্টিজগৎ তিনিই সৃজন করেছেন। তিনিই নির্মাণ করেছেন আকাশ ও জমিন, গ্রহ-নক্ষত্র, সকল প্রাণী ও জড়। তার ইশারায় সূর্য ওঠে, বৃষ্টি হয়, জমিনে ফসল ফলে, নদী বয়ে চলে, পাখি গান গায়... সকল সৃষ্টির স্রষ্টা তিনিই। তিনিই পরিচালনা করেন সকল সৃষ্টি।'

আমি বাকরুদ্ধ হয়ে লোকটির কথা শুনছিলাম। আমি আমার কর্তব্যের কথা ভুলে গেলাম। বাবার খামার দেখার কথা ভুলে আমি সেই উপাসনালয়ে রয়ে গেলাম। সেখানকার পুরোহিতদের কাছে গেলাম, জিজ্ঞেস করলাম খৃস্টান ধর্ম বিষয়ে।

'এ খৃস্টান ধর্মের উৎপত্তি কোথায়?'

'শাম– সিরিয়ার জেরুসালেমে।'

'কোথা থেকে পেলেন আপনারা এ ধর্ম?'

'ঈসা মসিহ আমাদের নবি ছিলেন এবং তিনি ঈশ্বরের পুত্রবৎ। তিনিই আমাদের জন্য এ ধর্ম নিয়ে আসেন। তার মায়ের নাম মেরি, তিনি স্বামীহীন